সারগর্ভ:

‘দ্বীন কায়েম: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা’- আবু আনওয়ার আল-হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ)

আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ'র **"দ্বীন কায়েম: একটি কৌশলগত পর্যালোচনা"** বেশ কিছু দিন আগে ফোরামে ধারাবাহি পোস্ট হয়েছে। 'আল হিকমাহ মিডিয়া' চার পর্বে সেটির পিডিএফ পরিবেশন করেছে। বৈশ্বিক জিহাদের কৌশল ও মানহাজ সম্পর্কে এটি একটি অতুলনীয় লেখা; বিশেষত বাংলা ভাষায়।

লেখাটা পড়ার পর ইচ্ছে হল তার খোলাসা ও সারমর্ম লিখে দিই। আবু আনওয়ার আল-হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ) যা লিখেছেন, সেটাও মূলত খোলাসা আকারেই লিখেছেন। তথাপিও ইচ্ছে হল একটা খোলাসা লিখে দিই, যাতে মূল লেখাটা পড়ার পূর্বে যদি কেউ এ খোলাসাটা পড়ে, তাহলে যেন পুরো লেখাটার একটা সারমর্ম তার সামনে এসে যায়। তাছাড়া আমার লেখাটার উপলক্ষ্যে হিন্দি হাফিজাহুল্লাহ'র লেখাটার আবার তাযকিরাহ্ হবে। অনেকে হয়তো সেটা পড়বে। এতে করে লেখাটার প্রচার-প্রসার বাড়বে। তাই খোলাসটা লিখতে ইচ্ছে হল।

উল্লেখ্য, আলোচনার শেষ পর্বে [**কৌশলগত পর্যালোচনা: বাংলাদেশ**] শীর্ষক অংশটাকে খুব বেশি সংক্ষিপ্ত না করে, হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ যেমন লিখেছেন, তেমনি রাখার চেষ্টা করেছি। কারণ, আমাদের জন্য এ আলোচনাটা অনেক জরুরী।

***

সারগর্ভ:

একটি কৌশলগত পর্যালোচনা- আবু আনওয়ার আল-হিন্দি (হাফিযাহুল্লাহ)

মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার কারণ: খিলাফাহ্ না থাকা এবং জাতীয়তাবাদ, গোত্রবাদ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা।

উত্তরণের পথ: খিলাফাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার মানহাজ ও পদ্ধতি কি হবে? এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। সে আলোকে বিভিন্ন দল, জামাত ও তানজীম সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল-

১. ইখওয়ানুল মুসলিমীন (মিশর) এবং অনুরূপ আদর্শের 'জামাআতে ইসলামী' (বাংলাদেশ, পাকিস্তান)।

২. হিযবুত তাহরীর।

৩. হামাস (ফিলিস্তিন), লস্কর-ই-তাইয়্যেবা (পাকিস্তান), জেএমবি (বাংলাদেশ)- ইত্যাদী আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নিদৃষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ।

৪. জামাআতুল বাগদাদী 'আই.এস' এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত।

৫. তানজীম আল-কায়েদা।

এর বাইরে আরও রয়েছে-

৬. তাবলীগ জামাত।

৭. শায়খ আলবানী রহ. প্রচারিত সালাফী দাওয়াত।

সকলেরই দাবি- তারা খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর কোনটার অবস্থান কেমন, হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ সে আলোচনায় যাননি। তিনি চেষ্টা করেছেন, বাস্তব ময়দানে কোন মানহাজটা খিলাফাহ্ কায়েমের জন্য যথাযথ কার্যকরি- সেটা পরিষ্কার করে তোলার।

(৬-৭) তাবলীগ এবং সালাফী দাওয়াতের বক্তব্য হলো- তারবিয়তের মাধ্যমে পুনরায় খিলাফাহ্ ফিরে আসবে।

তাবলীগ জামাত বলে- সব মুসলিম যদি সুন্নতী পোশাক পড়ে, সুন্নতি আমল করে, জামাতে সালাত আদায় করে এবং সর্বোপরি সাচ্চা মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে খিলাফাহ্ অটোমেটিক ফিরে আসবে।

সালাফি দাওয়াতের বক্তব্য হল- সব মুসলিম যদি সঠিক আক্বিদা গ্রহণ করে, শিরক-কুফর-বিদআত থেকে পরহেজ করে এবং দ্বীনের ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা গ্রহণ করে, তাহলে অটোমেটিক খিলাফাহ্ ফিরে আসবে।

পর্যালোচনা:

বাস্তবতার নিরিখে বলতে হবে- এ দুটো পদ্ধতি সমাজ সংস্কারের জন্য একটা পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে, কিন্তু কখনোই খিলাফাত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হতে পারে না। শুধুমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। না মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে, আর না সার্বিকভাবে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে এ রকম কোন নজীর আছে।

(১) ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামাআতে ইসলামী সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কথা বলে। অর্থাৎ সমাজে দাওয়াতের মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা হবে। অবশ্য বর্তমানে তারা গণতান্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইখওয়ান ও জামাআতে ইসলামী সায়্যিদ কুতুব রহ. এর আদর্শের দাবিদার হলেও মূলত তারা তাঁর আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এমনকি সশস্ত্র যুদ্ধ-জিহাদ ফরযে আইন হওয়াকেও তারা মানতে চায় না। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ভুল-বিকৃতি তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে।

(২) হিযবুত তাহরীরও মূলত সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শী। তবে তারা সশস্ত্র জিহাদকে ফরয বলে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মতাদর্শ হল- জনসাধারণকে খিলাফাহ'র গুরুত্ব বুঝানোর মাধ্যমে খিলাফাহ'র পক্ষে সোচ্চার করে তোলা হবে। অতঃপর সামরিক বাহিনীর কাছে নুসরত চাওয়া হবে। তারা নুসরত করলে ক্ষমতা দখল করত খিলাফাহ্ ঘোষণা দেয়া হবে। একটি মূল নেতৃত্ব থাকবে, যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শাখার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পলিসি ঠিক করবে। আর নুসরত না পাওয়া গেলে দাওয়াতের কাজ চলবে, তবে সশস্ত্র জিহাদে যাওয়া যাবে না। এভাবে তারা মুখে জিহাদ ফরযে আইন বললেও কার্যত তা পরিত্যাগ করেছে।

(৩) হামাস, লস্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি- ইত্যাদী আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নিদৃষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ: তাদের অভিমত- নিজ নিজ মুসলিম ভূখণ্ডের তাগুত ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে কিংবা দখলদার কাফেরে আসলিকে জিহাদের মাধ্যমে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা এবং শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। "নিকটবর্তী শত্রুর" বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

উল্লেখ্য, হামাস ও লস্কর-ই-তাইয়্যেবার সূচনা মূলত এই আদর্শের উপর হলেও, তারা পরবর্তীতে এই আদর্শ ত্যাগ করেছে, গণতান্ত্রিক ধারায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে এই ধারাটি প্রায় বিলুপ্ত।

(৪) জামাআতুল বাগদাদী 'আই.এস' এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত: একটি ভূমি দখল করা যা "সেফ যোন" [safe zone] হিসেবে কাজ করবে। একজন আমীর নিযুক্ত করে তাকে "খলিফা" ঘোষণা করা। তার নেতৃত্বে "নিকটবর্তী শত্রুর" বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে অঞ্চল দখল করা এবং সেখানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ'র কাছে বাইয়াত দাবি করা। তাদের নিযুক্ত খলিফাকে বাইয়াত দেয়া তারা সকল মুসলিমের উপর ফরয মনে করে। যারা বাইয়াত দেবে না তাদেরকে মুরতাদ ও মুনাফিক মনে করে। তাদের রক্ত হালাল মনে করে।

মূলত এই পদ্ধতিটি হল– প্রথমে খিলাফাহ্ ও খলিফা ঘোষণা করা তারপর এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করা। এই ঘোষিত খিলাফাহ্ ও খলিফার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে মুসলিমদের ঈমান ও কুফরের বিচার করা।

(৫) তানজীম আল-কায়েদা: দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠা করা। একটি অগ্রগামী দল তৈরি করা যাদের কাজ হবে- "সাপের মাথা" তথা বৈশ্বিক কুফর শক্তির কেন্দ্র আমেরিকাকে এবং পাশাপাশি পশ্চিমা অন্যান্য শক্তিসমূহকে আক্রমণ করা। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাত আছে তাদের সাথে মিলে কাজ করা। এই সব দলকে একটি বিশ্বব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করা। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করবে এবং মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ চালাবে। মূল গেরিলা যুদ্ধ শুরুর আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে। ক্ষেত্রে বিশেষে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এরা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শরীয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করবে [যেমন বর্তমান AQAP, AQIM, Al-Shabab]. প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলা, দাওয়াতের কাজ চালানো, আঞ্চলিক তাগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং যথেষ্ট ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ্ গঠন

করা এবং একই সাথে মূল শত্রু আমেরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া। একটি Asymmetric war of attrition– শক্তিক্ষয়ী দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব তথা আমেরিকাকে জড়িয়ে ফেলা। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকার অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে আমেরিকার সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করা। যখন পশ্চিমা বিশ্ব এবং আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালাতে এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের তাগুতদের সমর্থন করতে অপারগ হয়ে পড়বে, তখন শূরার মাধ্যমে উম্মাহ'র সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ্ ঘোষণা করা।

মূলত এটি দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি। আগের পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির পার্থক্য হল- এটি কোন আঞ্চলিক ভূমি দখলকে মূল উদ্দেশ্য মনে করে না। এটি আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। মনে করে- বর্তমানে গেরিলা যুদ্ধই উম্মাহ'র জন্য বাস্তবসম্মত একমাত্র পন্থা। "দূরের শত্রু"(আমেরিকার)-র উপর ফোকাস করে। আইম্মাতুল কুফরদের আগে ধ্বংস করাকে এই মানহাজ নিজেদের মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই মানহাজ শায়খ উসামা রহ. এর প্রবর্তিত মানহাজ।

খিলাফাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রস্তাবিত পদ্ধতির (মানহাজ) কৌশলগত পর্যালোচনা এবং তানজীম আল-কায়েদা তথা শায়খ উসামার পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব:

রাজনৈতিক পদ্ধতি:

ইখওয়ান, জামাআতে ইসলামী এবং হিযবুত তাহরীর জিহাদ পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। কাজেই তাদের আন্দোলনের ভিত্তিই হচ্ছে একটি ফরয ত্যাগের উপর।

ইখওয়ান এবং জামাআতে ইসলামী বর্তমানে কুফরী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। হিযবুত তাহরীর নুসরতের তলবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কাফের ও মুরতাদ বাহিনীর দ্বারস্থ হচ্ছে। উভয় দলের এ কর্মকাণ্ড শরীয়ত বহির্ভূত।

অধিকন্তু তাদের বিগত ইতিহাস খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার অনুকূল প্রমাণিত হয়নি। ইখওয়ান যখন ক্ষমতায় ছিল, জামাআতে ইসলামী যখন ক্ষমতাসীন সরকারের জোটে ছিল, তখন তাদের ইতিহাস আমরা দেখেছি। তারা খিলাফাহ্ তো পরের কথা, স্থানীয়ভাবেও ইসলামী

শরীয়াহ্ কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনে ইসলামকে তরলায়িত করে পশ্চিমা কুফরী মতাদর্শের সাথে একিভূত করার চেষ্টা করেছে।

এ সব বিষয় বাদ দিলেও, এদের গৃহীত পদ্ধতি খিলাফাহ্ প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, ধরা যাক ইখওয়ান এবং জামাআতে ইসলামী রাজনৈতিকভাবে এবং হিযবুত তাহরীর নুসরত লাভের মাধ্যমে কোন একটা দেশে ক্ষমতায় গেল। এরপর তারা যখন খিলাফাহ্ ঘোষণা করবে, তখন তাদেরকে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে-

১.

বিশ্বের সকল মুসলিমের হিজরতে জন্য দারুল খিলাফাহ্ তথা খিলাফাহ'র ভূমি উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা দিতে হবে। কেননা, খিলাফাহ্ কেবল একটা শব্দ নয়, বরং বাস্তবতা। এই বাস্তবতা ছাড়া কিছুতেই খিলাফাহ্ হতে পারে না।

২.

ফিলিস্তিন, কাশ্মির, সিরিয়া, চেচনিয়া ইত্যাদিসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। এদের মুক্ত করার জন্য সৈন্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠাতে হবে।

৩.

বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ্ কায়েম করতে হলে- বিশেষত মুসলিম ভূমিগুলোতে- ঐসব দেশের শাসকদের উৎখাত করতে হবে। ফলে খিলাফাহ্ কায়েমের জন্য তাদেরকে জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। এমতাবস্থায় আমেরিকাসহ বিশ্বের তামাম কুফরী শক্তি তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। যদি তা নাও করে, তবুও নিজ অঞ্চলে শরীয়ত রাখতে হলেও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। কারণ, আমেরিকা কিছুতেই একটা ভূমিতে ইসলামী শরীয়াহ্ কায়েম রাখতে দেবে না।

স্পষ্ট যে, আমেরিকাসহ বিশ্বের সম্মিলিত কুফরী শক্তির মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তাদের নেই। ফলে অতি দ্রুতই আমেরিকা তাদের ঘোষিত খিলাফাহ্ ধ্বংস করে

দেবে। এরপর তারা যদি আমেরিকার মুকাবেলায় দাঁড়াতে চায় তাহলে তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করতে হবে। তাদের খিলাফাহ্ তখন মুসলিম উম্মাহর আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবিক খিলাফাহ'র পরিবর্তে একটা গেরিলা দলে পরিণত হবে। শায়খ উসামা রহ. যে গেরিলা যুদ্ধের পন্থা গ্রহণ করেছেন, অবশেষে তাদেরকে সেদিকেই ফিরে যেতে হবে। উপরন্তু এভাবে খিলাফাহ্ ঘোষণা করে ক'দিন পরেই তা নিঃশেষ করে দেয়ার দ্বারা মুসলিম উম্মাহর মনোবল ভেঙে যাবে। কাজেই শুরু থেকে গেরিলা পন্থা গ্রহণ করাই বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হচ্ছে, যেমনটা তানজীম আল-কায়েদার মানহাজ।

সশস্ত্র পদ্ধতি:

সশস্ত্র পদ্ধতির মধ্যে আমরা তিনটি পদ্ধতি দেখছি-

১.

হামাস, লস্কর-ই-তাইয়্যেবা, জেএমবি- ইত্যাদী আঞ্চলিক জিহাদি জামাআত, যাদের জিহাদি কার্যক্রম নিদৃষ্ট অঞ্চলের মাঝে সীমাবদ্ধ: কোন কোন ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফলতা পেলেও বাস্তবে মূলত তারা কোন ভূখণ্ডেই তাগুত-কাফেরকে উৎখাত করে শরীয়ত কায়েম করতে সক্ষম হয়নি। উল্টো বরং তাগুত সরকারগুলো এদেরকে দমন করতে সক্ষম হয়েছে [যেমন- জেএমবি] অথবা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর তারা আর অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি [মরো লিবারেশান ফ্রন্ট]।

সর্বোপরি এই পদ্ধতিটির ফোকাস আঞ্চলিক। কিন্তু খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হল একটি বৈশ্বিক লক্ষ্য। যদি এই পদ্ধতিটি কোন ভূখণ্ডে সফলও হয়, তবুও তার মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে না, বরং বেশির চেয়ে বেশি একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হবে, যা কেবল তার নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলেই শরীয়াহ্ প্রতিষ্ঠা করবে।

২.

জামাআতুল বাগদাদী 'আই.এস' এবং সমমনা অন্যান্য জিহাদি জামাআত: এদের মধ্যে বাগদাদির জামাআতই সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করে আবু বকর আল-বাগদাদীকে খলিফা ঘোষণা করেছিল। তাদের অঞ্চলকে দারুল খিলাফাহ্ ঘোষণা দিয়েছিল।

আঞ্চলিক ক্ষমতা দখল করত খিলাফাহ্ ঘোষণার পর ইখওয়ান, জামাআতে ইসলামী এবং হিযবুত তাহরীরকে যে পরিস্থিতির শিকার হতে হবে বলা হয়েছে, তা এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাস্তবে তা ঘটেছেও। খিলাফাহ্ ঘোষণার অল্পদিন পরেই তারা আমেরিকা ও পশ্চিমা কাফের ও তাদের মিত্রদের দ্বারা ব্যাপক হামলার শিকার হয়েছে। একে একে হারাতে হারাতে তারা তাদের প্রায় সবক'টি ভূমিই হারিয়েছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের নিরাপত্তা দেয়া তো দূরের কথা, তারা তাদের নিজেদেরও রক্ষা করতে পারেনি। তাদের নেতাদের ধরে ধরে আমেরিকা হত্যা করেছে। মুসলিমদেরকে পশ্চিমা কুফরী শক্তি এবং শীয়াদের রোষানলে পতিত করেছে।

অধিকন্তু তারা নিজেরা মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক রক্তপাত ঘটিয়েছে। মুসলিমদের তাকফীর করে তাদেরকে হত্যা করেছে। মুসলিমদের একতা-ঐক্য নষ্ট করে বিভেদ ঘটিয়েছে। এরকম একটি দলের নিজেদের খিলাফাহ্ দাবি করা, তাদের বাইয়াতকে ফরয দাবি করা বাস্তবতা বহির্ভূত বাগাড়ম্বর বৈ কিছু নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিটি পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত ঘুরেফিরে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ইমারাহ্ প্রতিষ্ঠার দিকেই যেতে হচ্ছে। আর এটাই হল তৃতীয় সশস্ত্র পদ্ধতি; তানজীম আল-কায়েদা তথা শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহর মানহাজ, যা ইতিপুর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব, খিলাফাহ্ কায়েমের লক্ষ্যে শায়খ উসামা রহ. এর মানহাজই শ্রেষ্ঠ, কার্যকরি, সফল এবং বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হয়।

***

বৈশ্বিক জিহাদ এবং 'সাপের মাথায় আঘাত করা' নীতি:

জিহাদকে নিদৃষ্ট এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার ধারণা সর্বপ্রথম শহীদে উম্মাহ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. দেন।

আফগান জিহাদের শেষ দিকে যখন রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তখন শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম এবং তার অনুগত আরব মুজাহিদিনের একটি অংশ জিহাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ আবু ফিরাস আস-সুরি, শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি, শায়খ আবু

খালিদ আস-সুরি রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ মুহাম্মাদ আতেফ রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ সাইফ আল-আদেল, শায়খ মুহাম্মাদ ইসলামবুলি [আনওয়ার সাদতের হত্যাকারী মহান বীর খালেদ ইসলামবুলির ভাই], শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি এবং অন্যান্য আরো অনেকে। এসব বরেণ্য ব্যক্তিদের সবাই দুটি বিষয়ে একমত ছিলেন-

১. মুসলিম উম্মাহর উত্তরনের একমাত্র পথ– জিহাদ।

২. আফগানিস্তানের মাটিকে জিহাদের জন্য একটি ঘাঁটি তথা লঞ্চিং প্যাড হিসেবে ব্যবহার করা। কিন্তু ২ নম্বর বিষয়টি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ, এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল।

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের চিন্তা ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে মুজাহিদিনের একটু ঘাঁটি তৈরি করা, যাতে সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম যুবকরা এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে তারপর নিজ দেশে ফিরে গিয়ে জিহাদ শুরু করবে। প্রয়োজনে তাদের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দেয়া হবে। পাশাপাশি একটি অগ্রবর্তী দল গঠন করা হবে, যাদের কাজ হবে ফিলিস্তিনে গিয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং মুসলিম বিশ্বের যেখানেই মুসলিম নির্যাতিত হবে, আফগানিস্তানের মাটি থেকে এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিন সেখানে গিয়ে মুসলিমদের সহায়তায় জিহাদ করবেন।

আল-জিহাদ এবং জামাআতুল ইসলামিয়্যার মিশরিয় মুজাহিদিনের চিন্তা ছিল মিশরের মুজাহিদিনকে আফগানিস্তানের মাটিতে মিশরে জিহাদ করার জন্য প্রশিক্ষন দেয়া এবং একটি অগ্রবর্তী বাহিনী তৈরি করা। জিহাদের মাধ্যমে মিশরের ক্ষমতা দখল করা, তারপর মিশরকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা।

আলজেরিয়া এবং লিবিয়ার মুজাহিদিনের একইরকম পরিকল্পনা ছিল নিজ নিজ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন । শায়খ মতব্যক্ত করলেন, আফগানিস্তানের মাটিতে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা হবে। সারা বিশ্ব থেকে আসা মুসলিম যুবকদের এবং জিহাদী বিভিন্ন জামা'আর সদস্যদের সেখানে প্রশিক্ষন দেয়া হবে। নিজ নিজ ভুখন্ডে জিহাদী কার্যক্রম চালানোর জন্য আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয়া হবে।

নিপীড়িত মুসলিমদের সুরক্ষায় এই ঘাঁটি থেকে প্রশিক্ষিত মুজাহিদিনকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। এ সবই ঠিক আছে। একই সাথে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী গঠন করতে হবে। কিন্তু এই অগ্রবর্তী বাহিনীর লক্ষ্য শুধুমাত্র কোন আঞ্চলিক তাগুতকে উৎখাত করা না। নিছক ভূমি দখল করা না। ইস্রাইলের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো না। বরং এই অগ্রবর্তী দলের উদ্দেশ্য হবে বৈশ্বিক ক্ষমতার কাঠামোকে উল্টেপাল্টে দেয়া। কুফরের সিংহাসন ভেঙ্গে ফেলা এবং শক্তির যে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান তা কমিয়ে আনা। জিহাদকে কোন একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা। কুফরের কেন্দ্র, কুফরের পরাশক্তি, এ যুগের হুবাল- আমেরিকাকে আঘাত করা।

শায়খ উসামার 'সাপের মাথায় আঘাত করা' নীতি:

শায়খ উসামা রহ. বলেন, কুফরী শক্তি একটি বিষধর সাপের ন্যায় যার মাথা আমেরিকা। এই আমেরিকার সাহায্যেই মুসলিম বিশ্বের তাগুতগুলো টিকে আছে। এই আমেরিকার শক্তিতেই গুটিকয়েক ইয়াহুদি ইস্রায়িলে রাজত্ব করছে। সাপের মাথা ভেঙে দিলে যেমন সাপ তাড়াতাড়ি মরে যায়, বাকি শরীর দিয়ে কিছু করতে পারে না; আমেরিকাকে শেষ করতে পারলেও তেমনি বাকি সব কুফরী শক্তি এবং স্থানীয় মুরতাদরা দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্যথায় আমরা যদি স্থানীয় মুরতাদদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তাহলে এক মুরতাদকে সরালে আমেরিকা আরেকটাকে ক্ষমতায় বসাবে। যেমন- মিশরের মুজাহিদরা যখন আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে, তখন তার জায়গায় অ্যামেরিকা আরেক তাগুত হোসনি মোবারককে বসিয়ে দেয়। এতে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাও হবে না, খিলাফাহ্ও কায়েম হবে না, বরং আমাদের শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে। তাই 'সাপের মাথা আমেরিকা'র উপর আঘাত হানাই উপযুক্ত কাজ হবে। পারস্যের বিরুদ্ধে হযরত উমার রাদি. এই নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন।

যখন এরকম বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন পাকিস্তানে এক বোমা বিস্ফোরণে আব্দুল্লাহ আযযাম শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর পর শায়খ উসামাক আরব মুজাহিদিনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আল-কায়েদার আমীর নিযুক্ত হন। শায়খ উসামার "সাপের মাথায় আঘাত করা"-র পরিকল্পনাই আল-কায়েদার মানহাজ হিসেবে গৃহীত হয়। কাজ শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি তারা আঞ্চলিক জিহাদী আন্দোলনগুলোকে সহায়তা করতে থাকেন এবং নিজেদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে থাকেন।

আমেরিকাকে ময়দানে টেনে আনা:

শায়খ উসামা চাচ্ছিলেন, আমেরিকা কোন একটা মুসলিম ভূমিতে যুদ্ধের জন্য নেমে আসুক, যাতে সেখানে আটকে রেখে তাকে একটা দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত করে ধীরে ধীরে তার শক্তিতে ক্ষয় ধরানো যায়। এ লক্ষ্যে আল-কায়েদা বিভিন্ন স্থানে আমেরিকার উপর আঘাত হানতে থাকে। ৯২ সালে আমেরিকান সেনাদের লক্ষ্য করে ইয়েমেনে হোটেল বোমা হামলা হয়। ৯৩ সালে মোগাদিসুতে দু'টি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়। ৯৮ সালে নাইরোবি ও দারুস সালামে আমেরিকান দূতাবাসে জোড়া বোমা হামলা হয়। এতদসত্ত্বে আমেরিকা কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করতে চাচ্ছিল না। অবশেষে ৯/১১ এর চূড়ান্ত হামলাটা চালানো হয় একেবারে আমেরিকার কলবের মধ্যে। তখনই সে আফগানে হামলা করে ধ্বংসের ফাঁদে পা দেয়।

৯/১১ হামলার পেছনে শাইখ উসামার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিল:

১. অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে টেনে আনা এবং সেখানে তাদের আটকে ফেলা। পাশাপাশি অ্যামেরিকাকে অন্যান্য আরো ভূখণ্ডে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তাদের সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করা।

২. অ্যামেরিকার অর্থনীতিতে ধ্বস নামানো।

৩. অ্যামেরিকার জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট করে দেয়া।

আলহামদু লিল্লাহ এ তিনটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। আফগানিস্তানে দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ যুদ্ধের ফলে তার সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর সে কোন মুসলিম ভূমিতে নতুন করে সৈন্য পাঠাতে সাহস করে না। এ কারণেই শামে কত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও সে সৈন্য পাঠাচ্ছে না। আবার এ দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে গিয়ে তার অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছে। উপরন্তু আমেরিকারার এইসব ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তের কারণে আমেরিকান জাতিও তাদের নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। এখন তাকে যুদ্ধে জয় লাভের পরিকল্পনার পরিবর্তে জাতির সন্তুষ্টি রক্ষার দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

গেরিলা যুদ্ধের কৌশল:

গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযোগী হলো পাহাড় ও বনাঞ্চল যেগুলো তাগুতদের আওতামুক্ত। কেননা, সেগুলো মুজাহিদদেরকে বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেবে। মুজাহিদগণ সেখান থেকে হামলা করে আবার নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। পক্ষান্তরে গেরিলা যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী হচ্ছে শহরাঞ্চল। তবে এখানেও গেরিলা যুদ্ধ দাঁড় করানো সম্ভব, যদি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে জনগণ পানি, আর গেরিলারা মাছ তুল্য। গেরিলারা সাধারণ জনগণের মাঝেই অবস্থান করবে। তাদের মাঝেই প্রশিক্ষণ নেবে। তাদের থেকে এসে হামলা করে আবার তাদের কাছেই আশ্রয় নেবে। যদি ব্যাপক জনসমর্থন না থাকে তাহলে গেরিলাদের অবস্থা ডাঙায় তোলা মাছের ন্যায় হবে। ক'দিনের মধ্যেই জিহাদ ভেঙে যেতে বাধ্য। পক্ষান্তরে ব্যাপক জনসমর্থন থাকলে শহরাঞ্চলেও গেরিলা যুদ্ধ সফল হবে, যেমনটা শামে ঘটছে। নুসাইরিদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের ব্যাপক জনসমর্থন থাকায় মুজাহিদগণ সেখানে এক অসম শক্তির বিরুদ্ধেও অটল-অবিচল আছেন।

ইমারাহ্ ঘোষণা:

যথাযথ সামর্থ্য না থাকলে ইমারাহ্ ঘোষণা করা আল-কায়েদার মানহাজে নেই, এমনকি বিশাল অংশের উপর দখল থাকলেও না। কারণ,

- মুজাহিদগণ মূলত কোথাও স্থিতিশীলতায় নেই। আজ যে অংশের দখল আছে, হতে পারে কাল তা ছেড়ে দিতে হবে। যেমনটা অনেকবার ঘটেছেও।
- অফিসিয়ালভাবে ইমারাহ্ ঘোষণা করলে কাফেররা এর উপর আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। তখন তা রক্ষা করা কঠিন হবে। এ কারণেই যথেষ্ট এলাকা
- ইমারাহ্ ঘোষণা না দিয়ে কাজ করলে মুজাহিদদের উপর আক্রমণকে জনগণ নিজেদের উপর আক্রমণ বলে ধরবে। পক্ষান্তরে ইমারাহ্ ঘোষণা দিয়ে দিলে তখন জনগণ আল-কায়েদাকে নিজেদের থেকে আলাদা করে দেখবে। তাদের সমর্থন কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

এসব কারণে, যথেষ্ট এলাকা দখলে থাকা সত্ত্বেও সোমালিয়া, ইয়ামান এবং অন্যান্য অঞ্চলে আল-কায়েদা ইমারাহ্ ঘোষণা দেয়নি। ইরাকে যে 'আদদাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ্' ঘোষিত হয়, তা মূলত শায়খ উসামা ও অন্যান্য উমারাদের পরামর্শে হয়নি, বরং তারা নিজেরা পরামর্শ ব্যতিরেকেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে।

- অধিকন্তু ইমারাহ্ ঘোষণা দেয়া ছাড়াই যেহেতু শরীয়াহ্ কায়েম করা যাচ্ছে, তখন বর্তমান পরিস্থিতিতে ইমারাহ্ ঘোষণা না দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই।

গোপনে প্রসার ঘটানো:

এছাড়া আল-কায়েদার আরেকটি কৌশল হল গোপনে নিজেদের প্রসার ঘটানো। বৃদ্ধি, বিভিন্ন দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি গোপন করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারে না যাওয়া। অন্যদিকে জামাতুল বাগদাদীর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল-কায়েদা চায় সবাইকে বোঝাতে যে, তারা কোথাও নেই। জামাতুল বগাদাদী চায়, সবাইকে বোঝাতে যে, তারা সব জায়গায় আছে। বিভিন্ন দলের সাথে সম্পৃক্ততা গোপন করার ব্যাপারে শায়খ উসামার যুক্তি ছিল- যখনই আল-কায়েদার সাথে কোন দলের সম্পৃক্ততার প্রকাশ পায়, তখনই তাদের বিরুদ্ধে কুফফারের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ কারণে এটা গোপন রাখাই উত্তম। এ কারণে শামে আল-কায়েদার শাখা জাবহাতুন নুসরা আল-কায়েদার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা গোপন রেখে কাজ করছিল। কিন্তু অবশেষে জামাআতুল বাগদাদীর কারণে তা প্রকাশ পেয়ে যায়।

কৌশলগত পর্যালোচনা: বাংলাদেশ:

বাংলাদেশে জিহাদি আন্দোলনের ধারার সূচনা আফগান ফেরত মুজাহিদিনের মাধ্যমে। এদেশে কাজ করেছে প্রধান দু'টি জিহাদি সংগঠন: হারাকাতুল জিহাদ বাংলাদেশ (হুজি-বি) এবং জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। প্রথমটা কওমী ধাঁচের, দ্বিতীয়টা সালাফী ধাঁচের। (হুজি-বি)র প্রতিষ্ঠা ৯২-এ আর (জেএমবি)র প্রতিষ্ঠা ৯৮-এ শায়খ আব্দুর রহমান রহ. এর হাতে।

হারকাতুল জিহাদের একটি অংশ এক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় যোগ দেয়, যা তাদের ইরজার পরিচায়ক। অন্যদিকে জেএমবির একটি অংশের মধ্যে তাকফিরের ব্যাপারে গুলু (চরমপন্থা) বিদ্যমান।

বিভিন্ন কারণে জেএমবি'র মাঝে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। বাগদাদীর খিলাফাহ্ ঘোষণার পর নব্য জেএমবি'র একটা অংশ তাদের হাতে বাইয়াতও দেয়। অবশ্য পুরাতন জিএমবি ভাইয়েরা বাইয়াত দেননি।

হুজি-বি ও জেএমবি'র ব্যর্থতা: কারণ ও শিক্ষা:

প্রথম দিকে এ দুটি দল কিছুটা সফলতা দেখলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন-

- দুটি তানজীমই ঐ ভুলটি করেছে যা শাইখ আবু বাসির রহ. এর উদ্ধৃতিতে উঠে এসেছে, "**কারণ জিহাদি জামাআতগুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারনকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।**" হুজি-বি এবং জেএমবির ব্যাপারে এই কথা শতভাগ প্রযোজ্য। একারণেই রমনা বটমূলে হুজি-বির হামলা এবং আদালতে জেএমবির হামলা সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে প্রায় কোন সমর্থনই পায়নি বললেই চলে। বরং সরকারের প্রোপাগান্ডায় তা হিত বিপরীত হয়েছে।
- একই সাথে দুটি তানজিম একই ভুল করেছে, যাকে সামরিক পরিভাষায় বলা হয় "Strategic Overreach" বা "স্বীয় সক্ষমতার বাইরে প্রসার"। এর অর্থ হল, সক্ষমতা তৈরি করার আগেই নিজের কর্মকান্ডের পরিধি এমনভাবে বাড়ানো যা শেষ পর্যন্ত নিজের পতন ডেকে আনে। বিশেষ করে জেএমবির ব্যাপারে এটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। জাতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশের আগে জেএমবি তাদের আঞ্চলিক কাজে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছিলো এবং পরিস্থিতিও মোটামুটি অনুকূলে ছিল। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তারা এমন এক সময়ে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়, যখনও তাদের কাজের বিপরীতে যে প্রতিক্রিয়া হবে তার মোকাবেলা করার সক্ষমতা তাদের তৈরি হয়নি। যে কারণে সরকার বেশ দ্রুত তাদের শীর্ষ নেতাদের আটক করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেটওয়ার্ক উন্মোচনে সক্ষম হয়।
- নিজেদের কোন চোখে পড়ার মত মিডিয়া না ছিল না। এমনকি জেএমবি'র নিজেদের কোন মুখপাত্রও ছিল না। মিডিয়া একচেটিয়া ভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালিয়ে গেছে। তবে এটা সত্য: বর্তমানে ইন্টারনেটের যে প্রচলন আছে, যার কারণে অনলাইন মিডিয়ার প্রসার আছে, তেমনটা তখন ছিল না। কিন্তু তবুও

নিজেদের একটি মিডিয়া থাকার দরকার ছিল; বিশেষত জেএমবি'র, যেহেতু তারা জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

- যথাযথ অস্ত্রের মজুদ না রাখা। জিহাদি সংগঠনগুলোর জন্য জন্য আবশ্যক বিস্ফোরকের সকল উপকরণ প্রয়োজনী পরিমাণ মজুদ রাখা, উচু মানেরবিস্ফোরক আনা-নেয়ার রুট তৈরি এবং তা নিরাপদ রাখা। পাশপাশাশি একাধিক বোমা বিশেষজ্ঞ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। যদি সংগঠনে শুধু একজন বোমা বিশেষজ্ঞ থাকে তবে তার এই শিক্ষা কয়েকজন উপযুক্ত ছাত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং একবার ছাত্রদের প্রশিক্ষণ শেষ হলে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। এক জায়গায় রাখা যাবে না। যাতে সবাই এক সাথে ধরা না পরে। অন্যথায়, পুরো জামা'আর বিস্ফোরক ব্যবহারের সক্ষমতা কমে যাবে।
- সিকিউরিটি তথা সাংগঠনিক কাজের গোপনীয়তার নিরাপত্তাগত দুর্বলতা। আমরা এই দুই তানজিমের ক্ষেত্রে এখনো দেখতে পাই, কোন একটি কাজ করার পর পর এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজের আগেই [অর্থাৎ কাজের প্রস্তুতির সময়] তারা ধরা পরে যাচ্ছেন। এই দুই তানজীমের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কি করুণ অবস্থা তা বোঝার জন্য এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এ দুটি তানজীমের নেটওয়ার্ক এতো গভীরভাবে আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে, কোন একটি কাজের পর কাজের সাথে যারা জড়িত তাদের তো বটেই, অন্যান্য আরো কিছু সদস্যকেও তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে।

পর্যালোচনা:

হুজি-বি এবং জেএমবি'র ইতিহাস থেকে বেশ কিছু মৌলিক বিষয় উঠে আসে যা আমাদের সকলের গভীরভাবে উপলব্ধি করা উচিৎ।

১.

যদি আমরা আসলেই বাংলাদেশে এমন একটি জিহাদ শুরু করতে চাই যা বাংলাদেশের মানচিত্র পাল্টে দেবে এবং বাস্তবতা আগাগোড়া বদলে দেবে, তাহলে আমাদের একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, আসবাব ও রসদ মজুদ করতে হবে। হুটহাট কিছু করা যাবে না। একটি দুটি প্রলয়ঙ্করী হামলা দিয়ে

বিশ্বের মনোযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরিয়াহ কায়েম, তাগুতের পতন এবং সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে না।

২.

দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের মধ্যে মুজাহিদিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং সমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। শাইখুল মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আযযাম যাকে বলেছেন 'দাওয়াত' আর মাও সেতুং যাকে বলেছে 'জনগণের জাগরণের পর্যায়।' জনগণ ছাড়া গেরিলা যোদ্ধা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। মনে রাখতে হবে, আমাদের শত্রুর বিমান, ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ আছে। ক্রুসেডার আর হিন্দুত্ববাদি ভারতের সমর্থন তার আছে। আছে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন, আর একটি রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। জনগণের সমর্থন ছাড়া আপনি যদি চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তবে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হবে।

৩.

বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ও গাঁথুনিকে বুঝতে হবে। শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) তারدعوة المقاومة العالمية الإسلامية (The Global Islamic Resistance Call) গ্রন্থে কোন ভূমির Open front জিহাদের জন্য উপযুক্ততা পরিমাপের জন্য কিছু ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে একটি হল- ভৌগোলিক অবস্থা। যেহেতু মুজাহিদিন এবং তার শত্রুদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য নেই, তাই তাদের যুদ্ধ হবে একটি ভারসাম্যহীন যুদ্ধ বা Asymmetric Warfare. এধরণের যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকে **শক্তিশালী শত্রুকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে টেনে এনে, শক্তিক্ষয়ের মাধ্যমে তার পরাজয় ঘটানো।** যেমন অ্যামেরিকাকে আফগানিস্তানে টেনে এনে পরাজিত করা হয়েছে।

শাইখ আবু মুসআব আস-সুরির (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) তার কিতাবে ব্যাপক বিশ্লেষণের পর দেখিয়েছেন- দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ভূমি হল যেখানে পর্বত ও জঙ্গল আছে। কারণ পাহাড় ও জঙ্গল গেরিলাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উত্তম। কারণ এগুলো বিমান হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়। এছাড়া মরুভূমির উপস্থিতি এবং দুর্গম ভূখণ্ড গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সমতল। যে

কারণে যে নীতি আফগানিস্তানে প্রযোজ্য, তা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়। সোমালিয়া, ইয়ামান, ইসলামী মাগরিব, লিবিয়া, কাশ্মীর, ওয়াযিরিস্তান, কাউকায- সবগুলো জায়গাতেই পাহাড় বা জঙ্গল কিংবা মরুভূমি আছে এবং এসব জায়গা বেশ দুর্গম। যে কারণে এসব ভূখণ্ডের মুজাহিদিন গেরিলাযুদ্ধে সফল হয়েছেন।

তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি করা যেতে পারে? এজন্য আমরা অন্য দুটি ভূখণ্ডের দিকে তাকাতে পারি যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে। এ দুটি ভূখন্ড: ইরাক এবং শাম। হ্যা, একথা সত্য যে শাম বা ইরাক কোনটাই বাংলাদেশের মতো সমতল না। শামে পাহাড় এবং মরুভূমি দুটোই আছে, আর ইরাকেও মরুভূমি আছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, শাম এবং ইরাকে জিহাদ এসব দুর্গম অঞ্চলে শুরু হয়নি। বরং এ দু'ক্ষেত্রেই শহর কেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের প্রসার ঘটেছে। বিশেষ করে শামে। আর এখানেই সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনের প্রশ্ন আসে। ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল অ্যামেরিকার আগ্রাসনের মাধ্যমে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের উপর অ্যামেরিকা সমর্থিত শীয়া শাসন চাপিয়ে দেয়ার কারণে। একই সাথে ইরাকি সমাজ গোত্র নির্ভর। যে কারণে গোত্রীয় নিয়মকানুনের প্রভাব ইরাকি সমাজে ছিল। একই সাথে গোত্রগুলোর কাছে কিছু অস্ত্র মজুদ ছিল, যেগুলো সবসময় তাদের কাছে থাকে।

অন্যদিকে শামে বিপ্লব এবং জিহাদ শুরু হয় শহরগুলোতে। দামেশক, দারা, আলেপ্পো, ইদলিব, হিমস, হামা- এসব শহর ছিল বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। শামের মানুষ ভয়াবহ প্রায় ৫ বছরের যুদ্ধের পরও; প্রচন্ড অনাহার, ব্যাপক মৃতু এবং অবর্ণনীয় কষ্টের পরও জিহাদ আঁকড়ে আছেন। এর কারণ কি? কারণ হল- সামাজিক বাস্তবতা। শামে সংখ্যালঘু নুসাইরি সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের শাসন করতো। যখন বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়, তখন সরকার ব্যাপকভাবে সুন্নিদের হত্যা-ধর্ষন-নির্যাতন শুরু করে। যে কারনে সুন্নিরা বাধ্য হয় অস্ত্র তুলে নিতে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল- বাংলাদেশে ইরাকের মতো শীয়া-সুন্নি বিভেদ নেই। এখানে শীয়ারা সংখ্যায় অল্প এবং তারা ক্ষমতায়ও নেই। বাংলাদেশের চাইতে পাকিস্তানে শীয়াদের প্রকোপ অনেক বেশি। সেখানে শীয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শীয়াবিরোধি কৌশল দিয়ে সেখানে তেমন আগানো যায়নি। সুতরাং পাকিস্তানের মতো জায়গায়, শীয়া-সুন্নি বিভেদ বিদ্যমান, সেখানে যদি শুধুমাত্র শীয়া বিরোধিতার কৌশল জিহাদের জন্য

কার্যকর না হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে শীয়া-সুন্নি বিভেদ নেই, সেখানে এটা কতটুকু কার্যকর হতে পারে?

যারা মনে করে বাংলাদেশে শীয়াবিরোধি কিংবা আহমদিয়্যাহ্-বিরোধি হামলা দিয়ে জনগণকে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে, তারা নির্বোধ। একইভাবে রমনা বটমূল, নিউ ইয়ার কিংবা ভ্যালেন্টাইন ডের কোন অনুষ্ঠানে চাঞ্চল্যকর হামলা করা তুলনামূলক সহজ, কিন্তু কৌশলগত ভাবে এগুলোর তেমন কোন তাৎপর্য নেই। কারণ সাধারণ জনগণকে এধরনের হামলাগুলো দূরে সরিয়ে দেবে। এ কারণে পরিস্থিতি সৃষ্টির আগে এমন কোন হামলা করা যাবে না, যা মুজাহিদিন ও জিহাদকে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে সবচেয়ে বেশি যা মিলে, তা হল- শামের পরিস্থিতি। যদিও শামের মতো নুসাইরিরা বাংলাদেশে নেই, কিন্তু বাংলাদেশে একটি জনসমর্থনহীন সরকার আছে, যারা সরাসরি ভারত দ্বারা সমর্থিত এবং যে সরকারের অধীনে সচিবালয়ে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপকভাবে মুশরিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বরং বর্তমানে বিচারবিভাগের প্রধান এক মুশরিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রশাসনে মুশিরকদের এই ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা ও অসন্তোষ রয়েছে। একই সাথে সরকারের পরিষ্কার ইসলাম বিরোধী একটি ইমেজ আছে, যা জনগণের কাছে পরিষ্কার। কিন্তু কিভাবে ইসলামের দিকে আসতে হবে, কিভাবে ইসলাম আনতে হবে- এ নিয়ে মানুষ এখনও ওয়াকিফহাল না। একই সাথে আছে কওমি ভাইদের উপর হাসিনার ক্রমাগত অত্যাচারের এক ধারা, যা শুরু হয়েছিল ৫ মে এবং যার সিলসিলা আমরা দেখতে পেয়েছি বিবাড়িয়াতে। পাশপাশি বাড্ডাতে মন্দিরে পবিত্র কুর'আন পোড়ানোর মতো ঘটনা এবং সেই মালাউনকে পুলিশের নিরাপত্তা দেয়া- এই সরকারের ইসলামবিরোধী চরিত্রকে আরো পরিষ্কার করে তোলে। এ ধরণের ঘটনাকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে তাকে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, তবে আমরা এ ঘটনাটির ক্ষেত্রে তা করতে ব্যর্থ হয়েছি।

মোট কথা বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের একমাত্র উপযোগী মডেল হল শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধ, যেমনটা আমরা শামে দেখছি। আর এরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ সফলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন জনসমর্থন এবং জনসম্পৃক্ততা। তবে

জনসমর্থন তথা জনসম্পৃক্ততা তৈরির হন্য শীয়া, আহমদিয়্যাহ্, মিশনারি বা এনজিওদের টারগেট করা বাংলাদেশের জন্য কার্যকরী হবে না– যদিও এ প্রতিটী কাফির গোষ্ঠীই ইসলামের শত্রু। জনসমর্থনহীন একটি শাসক যদি সরাসরি মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যেকোন মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে যদি শাসক এবং শাসকের সমর্থক গোষ্ঠীকে মুসলিমদের বিপরীতে দেখানো যায় [অর্থাৎ আওয়ামীলীগ বনাম মুসলিম, আওয়ামীলীগ-সেক্যুলার বনাম মুসলিম, আওয়ামী-হিন্দু-সেক্যুলার বনাম মুসলিম] তাহলে তখন শহর ভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধ এমন ভুখন্ডেও সফল হতে পারে, যা ভৌগলিক ভাবে গেরিলা যুদ্ধের জন্য অতোটা উপযুক্ত না।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে- এ যুদ্ধটা [কাফির/তাগুত/ভারত/আওয়ামী লীগ বনাম ইসলাম] এভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। [হাসিনা-ভারত সেক্যুলার বনাম জিহাদি বা আল-কায়েদা বা সালাফি বা দেওবন্দি] এভাবে চিত্রায়িত করলে হবে না। এর উত্তম প্রমাণ হল শাহবাগ বনাম যখন জামাত ছিল অর্থাৎ মিডিয়া যখন এভাবে চিত্রায়িত করছিল, তখন শাহবাদ জিতেছিল। কিন্তু যখন ব্যাপারটা শাহবাগ বনাম ইসলামে রূপ নিল, তখন মিডিয়ার হাজার প্রপাগান্ডা কোন কাজে আসলো না। অথচ এর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ যখন ব্যাপারটা একটা দলকেন্দ্রিক অর্থাৎ জামাত বনাম শাহবাগ ছিল, ততোক্ষণ কিন্তু শাহবাগীরাই জিতেছিল। তাই জিহাদিদের কাজ হবে জিহাদের পরিস্থিতি শুরুর আগ পর্যন্ত সংঘাতটাকে [আওয়ামী-নাস্তিক-সেক্যুলার-ভারত-ক্রুসেডার জোট বনাম ইসলাম]- এভাবে চিত্রায়িত করা, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় একবার জিহাদ শুরু হয়ে গেলে তখন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়া। আর এটা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে।

কারণ, শায়খ উসামার ভাষায়–

জিহাদি আন্দোলনের উচিৎ সে শত্রুকে আক্রমণ করা, যার কুফর বেশি যাহের তথা সুস্পষ্ট; সে শত্রুকে না, যার কুফর বেশি (কিন্তু সুস্পষ্ট নয়)।